মাতৃসান্নিধ্যে 'কেদারের মা'

শ্রীশ্রীমায়ের সকল জীবনীগ্রন্থে 'কেদারের মা'য়ের প্রসঙ্গ আছে। কোয়ালপাড়া রামকৃষ্ণ যোগাশ্রমের প্রধান উদ্যোক্তা ও পৃষ্ঠপোষক কেদারনাথ দত্তের জননী তিনি। তাঁর পিতা দীননাথ দত্ত শ্রীশ্রীমায়ের শৈশবকালে জয়রামবাটীতে একটি পাঠশালা পরিচালনা করতেন এবং শ্রীশ্রীমায়ের পিতা রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে থাকতেন। ফলে দীননাথ দত্তের পরিবার সম্পর্কে শ্রীশ্রীমা জ্ঞাত ছিলেন। ''কেদারনাথের জননী সময় সুযোগ মত জয়রামবাটীতে স্বামীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যেতেন। ফলে খুব

তড়িৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রাক্তন অধ্যাপক, প্রাণিবিদ্যা বিভাগ, উত্তরপাড়া রাজা প্যারীমোহন কলেজ; গবেষক ও লেখক

কাছ থেকে শ্রীমা সারদাদেবীকে তাঁর দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল। শ্রীরামকৃষ্ণের মহাসমাধির পরে জয়রামবাটী অঞ্চলে যে দুজন ভক্তমহিলা শ্রীমা সারদাদেবীকে জগদম্বাজ্ঞানে নিজেদের হৃদয়াসনে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তাঁদের মধ্যে জয়রামবাটীর মানগরবিনী দেবী (ভানুপিসি) এবং কোয়ালপাড়ার কেদারজননী অন্যতমা।''[১] কোয়ালপাড়া আশ্রমের প্রথমদিকের পূজারি স্বামী পরমাত্মানন্দজীর (প্রভাত মহারাজ) কাছ থেকে জানা যায় যে কেদার-জননীর নাম ছিল তরণীবালা দেবী। তিনি কোয়ালপাড়ায় নিজের বাড়িতে মাকে আনার জন্য ব্যাকুল হয়েছিলেন। সেইসময় কেদারনাথকে কেন্দ্র করে কোয়ালপাড়ায় সমবেত হয়েছেন কিশোরী, বরদা, বিভূতি, গগন, মতি, অমূল্য, হরি, বলরাম, রাজেন, বিনোদ, দিবাকরের মতো একদল তরুণ। এছাড়াও কৃষ্ণচন্দ্র হেঁস, ক্ষেত্রনাথ মণ্ডল, ফকিরচন্দ্র মণ্ডল, হৃষীকেশ রায়, গোলকচন্দ্র চৌধুরি, হরিপদ মাঝি প্রমুখের নাম করা যায়।

স্বামী সারদেশানন্দ জানিয়েছেন, ''প্রৌঢ়বয়সে কেদারের মা মায়ের মহিমা জ্ঞাত হইয়া একান্তভাবে তাঁহার চরণে আশ্রয় করেন এবং একমাত্র কন্যা দেহত্যাগ করিলে মাকে অবলম্বন করিয়া হৃদয়ের দুর্জয় শোক-জ্বালা নিবারণ করেন। মায়ের পাদপদ্মে যেমন তাঁহার অবিচলিত ভক্তিশ্রদ্ধা ও সাক্ষাৎ জগদম্বাজ্ঞানে সেবাপূজার ভাব দেখা যাইত; তেমনি মাকে কচি মেয়ের মতো দেখিয়া সন্তান বাৎসল্যের

ও স্নেহের টানের পরিচয় পাওয়া যাইত তাহাতে মনপ্রাণ মোহিত হইত। মা কলিকাতা যাত্রা করিয়াছেন—কোয়ালপাড়া আশ্রম হইতে ঘোড়ার গাড়ীতে বিষ্ণুপুর যাইতেছেন। সঙ্গে মহারাজেরা, লোকজন, খাওয়ার ও জলখাবারের সব কিছু ব্যবস্থা ঠিক করা আছে। মায়ের যাত্রাকালে কেদারের মা একখানা ন্যাকড়াতে কিছু খুদভাজা বাঁধিয়া সেবিকার হাতে দিয়া অশ্রুপূর্ণলোচনে বলিলেন, 'রাস্তায় খিদে পেলে মাকে দুটি খাওয়াবার জন্যে—।' কচি মেয়ের জন্য মায়ের প্রাণ অস্থির।"[২]

কেদার-জননী যেমন মাকে কন্যাবৎ স্নেহ উজাড় করে দিয়েছিলেন, তেমনি মাও তাঁর সকল আবদার ও ইচ্ছাপূরণে নিয়ত সচেষ্ট থেকেছেন। সন্ন্যাসের প্রতি স্বাভাবিক অনুরাগ থাকলেও মা সন্তানদের গৈরিকধারণের অনুমতি দেওয়ার ব্যাপারে খুব সতর্ক থাকতেন। কেদারনাথ দত্তকেও মা প্রথমে সে-অনুমতি দিতে চাননি। পরে যখন জানতে পারলেন যে তাঁর মা সম্মত, তখন তিনি তাঁর সন্ন্যাস অনুমোদন করেন। কেদারনাথের স্বাস্থ্য ভাল ছিল না, হাঁপানিতে ভুগতেন। তাই তাঁর জননী ছেলের সন্ন্যাসগ্রহণের পূর্বে মায়ের কাছে প্রার্থনা জানান যে, তাঁকে যেন পুত্রশোক পেতে না হয়। মা তাঁর প্রার্থনা মঞ্জুর করেছিলেন। শ্রীমার দাক্ষিণাত্য (১৯১১) ও কাশী ভ্রমণে (১৯১২) তিনি সঙ্গী হন এবং উদ্বোধনবাড়িতেও তাঁর সঙ্গে বাস করেন।[৩]

স্বামী ঈশানানন্দ বিরচিত 'মাতৃসান্নিধ্য' গ্রন্থ থেকে জানা যায়, শ্রীশ্রীমা কলকাতা থেকে কেদারবাবুকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন, ''বাবাজীবন কেদার, তোমরা যদি কোয়ালপাড়ায় আমার জন্য একখানি ঘর করে রাখতে পারো, তাহলে দেশে গিয়ে মাঝে মাঝে তোমাদের ওখানে থাকি। জয়রামবাটীতে ভাইদের সংসারে ঝামেলা দিন দিন বাড়ছে, আর ওদের ঝঞ্ঝাট সবসময় সহ্য করতে পারি না। সামান্য একটু অসুখ-বিসুখ হলেও দেশে একটু 'ঠাঁই-নাড়া' হবার উপায় নেই।"[৪] এই চিঠি পেয়ে আশ্রমের কর্মীরা পরম উৎসাহে কায়িক শ্রমে কেদারনাথের বসতভিটায় শ্রীশ্রীমার আবাসগৃহ নির্মাণ করেন। তাতে ছিল পৃথক তিনটি ঘর, একটি চালা এবং একটি খাটা শৌচালয়। মা ১৩২২ সালের (১৯১৫ খ্রিস্টাব্দ) বৈশাখ মাসের প্রথম দিকে কলকাতা থেকে জয়রামবাটী ফেরার পথে কোয়ালপাড়ার ওই নবনির্মিত গৃহে পদার্পণ করেন। গৃহের সুব্যবস্থা দেখে তিনি খুব আনন্দিত হন। সেটি পরে 'জগদম্বা আশ্রম' নামে চিহ্নিত হয়। সেবারে মা বলেছিলেন, ''এবার আর থাকা হবে না—সঙ্গে সব অনেকগুলি আছে (রাধু, মাকু, তাদের স্বামীরা ইত্যাদি)। এদের সব জয়রামবাটী গিয়ে রেখে পরে নিরিবিলি হয়ে রাধুকে নিয়ে এসে দিন কতক থাকব।"[৫] ওই বছরই ভাদ্র মাসে রাধু, মাকু, নলিনীদি, ছোটমামি প্রমুখকে সঙ্গে নিয়ে ওই গৃহে মা পনেরো দিন থাকেন।

শ্রীশ্রীমা কোয়ালপাড়া আশ্রমে পদার্পণ করেছেন পনেরো বার। কখনও কলকাতা থেকে জয়রামবাটী প্রত্যাবর্তনকালে আবার কখনও জয়রামবাটী থেকে কলকাতা যাওয়ার পথে, কখনও একবেলা, কখনও একদিন বা দুদিন। আবার কখনও পনেরো দিন (১-১৫ সেপ্টেম্বর ১৯১৫), দেড়মাস (মার্চের মাঝামাঝি থেকে এপ্রিলের শেষ, ১৯১৮) এবং ছমাস (২৯ জানুয়ারি থেকে ২৩ জুলাই ১৯১৯)।[৬]

স্বামী পরমাত্মানন্দের স্মৃতিকথা থেকে একটি ঘটনা জানা যায়। মা ১৩১৮ বঙ্গাব্দের ৭ অগ্রহায়ণ (১৯১১ খ্রিস্টাব্দ) কোয়ালপাড়া আশ্রমে শ্রীশ্রীঠাকুর ও নিজের ফটো প্রতিষ্ঠা করে পূজা করেন। কিশোরী মহারাজ তখন ব্রহ্মচারী; তিনি হোম করেন। শ্রীশ্রীমা জয়রামবাটী থেকে সকাল সকাল কোয়ালপাড়া পৌঁছে স্নান সেরে পূজার ঘরে ঢোকার সময়, আশ্রমবাসীরা মায়ের গমনপথে লাল শালুর কাপড় বিছিয়ে তার উপর পদ্মফুলের পাপড়ি ছড়িয়ে রেখেছিলেন। স্বামী পরমাত্মানন্দ ১৯৪৭

সাল থেকে কিছুকাল কোয়ালপাড়া আশ্রমে পূজা করার সময় ঠাকুরঘরে একটি পুরনো চাবিহীন ট্রাঙ্ক দেখতে পান। সেটি খুলে দেখেন যে তার মধ্যে দু-তিনটি ভাঙা পূজার বাসন, ভাঙা ঘণ্টা, হাতল ভাঙা একটি কালোরঙের চামর, একতাল গঙ্গামাটি ও একটি পুরাতন জীর্ণ লাল শালুর পুঁটলি। পুঁটলির মধ্যে শুকনো পদ্মফুলের পাপড়ি। পরে একদিন কিশোরী মহারাজকে সেকথা জানালে তিনি বলেন, শ্রীশ্রীমা জয়রামবাটী থেকে আসামাত্র কেদার-জননী একটি গামলায় জল ধরে মায়ের পা ধুইয়ে দেন; পরে তাঁরই নির্দেশে গঙ্গামাটিতে মায়ের পাদোদক মিশিয়ে একটি মাটির তাল করে শুকিয়ে রাখা হয়েছিল। ট্রাঙ্কটিতে রাখা ওই লাল শালু, শুকনো পদ্মপাপড়ি এবং মাটির তাল শ্রীশ্রীমার পদস্পর্শপূত। এই বিষয়গুলি স্মরণ করলে কেদার-জননীর প্রতি শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়।[৭]

১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে, পৌষমাসে জয়রামবাটীতে শ্রীশ্রীমা একবার খুব অসুস্থ হয়ে পড়েন। সেইসময় কেদারের মা প্রায়ই এসে মাকে দেখে যেতেন। একদিন তিনি এসে শ্রীশ্রীমাকে একটু ভাল দেখলেন, কিন্তু যখন শুনলেন যে তাঁর আহারে তেমন রুচি নেই তখন তিনি মাকে চুপি চুপি বলে গেলেন যে, তিনি এমন একটি জিনিস তৈরি করে দেবেন যা খুবই মুখরোচক এবং খেলে রুচি হবে।

পরদিনই দীর্ঘপথ পায়ে হেঁটে এসে তিনি সেবিকার হাতে সেই খাবারটি দিয়ে যান। তার নাম 'খয়না কোটা'। টাটকা ভাজা খইয়ের ভিতর যে-আধফোটা মুড়ির মতো খই থাকে, সেগুলি বেছে পরিষ্কার করে তার সঙ্গে পরিষ্কৃত ভাজা তিল মিশিয়ে খুব মিহি চূর্ণ করে, অল্প ঝাল ও নুন মিশিয়ে তৈরি করা হয়। দেখতে ছাতুর মতো। গোপেশ মহারাজ (স্বামী সারদেশানন্দ) রোজ ভোরে এসে মায়ের খবর নিতেন। সেদিন তিনি এলে মা বললেন, ''বাবা, ভাল আছি। একটু খিদে পাচ্ছে।'' সন্তান তাঁকে কী দেবেন বুঝে উঠতে পারছেন না, তখন মা সেবিকাকে আস্তে আস্তে কেদারের মায়ের আনা খাবারটির কথা বললেন। সেবিকা একটি পাত্রে সেটি এনে দিলে মা পরম তৃপ্তিতে সেটি গ্রহণ করলেন।[৮]

কেদারের মা প্রকৃতই সুগৃহিণী ছিলেন। মায়ের জন্য চিঁড়ের মোয়া, মুড়কির মোয়া, তিলের নাড়ু, পোস্ত বড়ি ইত্যাদি তৈরি করে দিয়ে যেতেন। মা সেগুলি ভালবাসতেন। মায়ের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য তাঁর ভাবনার অন্ত ছিল না। মায়ের দেহত্যাগে বৃদ্ধা কেদারের মা অত্যন্ত ব্যথিত হয়ে শয্যা নেন। সেই শয্যাই রোগশয্যায় পরিণত হয়েছিল। ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে আশি বছর বয়সে মুমূর্ষু অবস্থায় তাঁর মুখে কেবল 'মা' 'মা' ধ্বনি উচ্চারিত হত। অন্তিমমুহূর্তে তিনি বলে উঠেছিলেন, ''মা, তুমি এসেছ, যাই মা।'' বৃদ্ধা শেষবারের মতো চক্ষু মুদ্রিত করলেন, যাত্রা করলেন অমৃতের পথে।[৯] ✠

তথ্যসূত্র

১। সম্পাদনা : স্বামী শিবপ্রদানন্দ, *শ্রীমা সারদা ও তাঁর বৈঠকখানা* (শতবর্ষ স্মারকগ্রন্থ), রামকৃষ্ণ যোগাশ্রম, কোয়ালপাড়া, বাঁকুড়া ২০১৭, পৃঃ ৪০ (এরপর, *বৈঠকখানা*)

২। স্বামী সারদেশানন্দ, *শ্রীশ্রীমায়ের স্মৃতিকথা*, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ১৯৮৯, পৃঃ ২৩৯-৪০ [এরপর, *স্মৃতিকথা*]

৩। দ্রঃ স্বামী গম্ভীরানন্দ, *শ্রীমা সারদা দেবী*, উদ্বোধন কার্যালয়, ১৪০৭, পৃঃ ১৮৯ এবং ২০৯ [এরপর, *শ্রীমা সারদা দেবী*]

৪। স্বামী ঈশানানন্দ, *মাতৃসান্নিধ্যে*, উদ্বোধন কার্যালয়, ১৯৯১, পৃঃ ২৯

৫। *শ্রীমা সারদা দেবী*, পৃঃ ২১৬

৬। দ্রঃ *বৈঠকখানা*, পৃঃ ২৮৩-৮৪

৭। তদেব, পৃঃ ২৮-২৯

৮। দ্রঃ *স্মৃতিকথা*, পৃঃ ১৪৮-৪৯

৯। স্বামী পরমাত্মানন্দজী প্রদত্ত তথ্য